ষোল অন্ধকার

বেঙ্গল ট্রয়কা পাবলিকেশন

সূচিপত্র

অনিন্দিতা নাথ	৫	উত্তরসূরী
ঐষিক মজুমদার	১৮	নদীর ধারে
কুন্তল বিশ্বাস	৩০	মসলিন
চিন্তন দত্ত	৩৯	সুরের রণনে
জিৎ দত্ত	৬৪	মৌসুমী
দেবলীনা চট্টোপাধ্যায়	৭৫	রাইজ অফ দ্য ফিন্ড
পিয়ালী ঘোষ	৮৭	বৃষ্টি নামার পরে
মোহনা দেবরায়	৯৬	শরণ
রিয়া ভট্টাচার্য	১১৪	টুইঙ্কল টুইঙ্কল
শরণ্যা মুখোপাধ্যায়	১২২	অভিযোজন
সঞ্চারী চক্রবর্তী চ্যাটার্জী	১৩৪	ভালোবাসা থেকে যায়
সম্বিতা	১৪৪	ভুতুমপুরের জঙ্গলে
সায়ন্তী সাহা	১৫৫	ওরা আসছে
সুচেতনা সেন কুমার	১৭২	বিষয় নাকি বিষ
সৌরভ আঢ্য	১৯৩	কাম পাশ
রাজদীপ ভট্টাচার্য্য	২১০	বংশের রাক্ষস

এখন ঘরের দরজাটা ভেজানো আছে, আমি বন্ধ করে দিইনি। কিন্তু কী যায় আসে তাতে? ও আসলেই দরজা আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যাবে। ত্রস্ত বলির পাঁঠার মতো হাড়িকাঠে মাথা ঢুকিয়ে বসে থাকতে হবে। কান অবধি চেরা শীতল হাসি নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসে ও। চুলের মুঠি ধরে নিয়ে যায় ওই অতল পাতালে। খুঁজতে থাকি, সেই খোঁজার কোনও শেষ নেই। একটা টিকটিক শব্দ বেজে চলে অবিরাম, যেন জানান দেয় আমার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, আছে শুধু খোঁজার চেষ্টা। খুঁজতে হবে তাকে।

সে একই প্রশ্ন করে, আর আমি খুঁজতে থাকি আমার উত্তরসূরীকে।

হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ শব্দ হয় আর আমি সেই বন্ধ দরজা পেরিয়ে ফিরে আসি বর্তমানে। ফিরে যাই আমার গল্পের শুরুর দিকে। স্মৃতি রোমন্থন করে খুঁজে আনি সেই অভিশপ্ত দিনগুলোকে।

"মা বাবা মারা যাওয়ার পর পুরুলিয়ার এই বাড়িতে আমি চলে আসি। বাড়িটা আমার মায়ের মামাবাড়ি। বাড়িটার নাম ভারী অদ্ভুত – 'উত্তরসূরী'। শুনেছিলাম বড়মার শেষ চিহ্ন এই বাড়ি। বাড়িটার সম্পর্কে একটা গুজব ছড়িয়ে আছে - কোনও পুরুষ মানুষ ওই বাড়িতে থাকতে পারে না। এমনকি বাড়িটা না চাইলে কেউ ওই বাড়িতে থাকতে পারে না। আর জোর করতে গেলেই হারিয়ে যাবে সে কালের অতলে। যেমন আমার মা-বাবা...

আমি যখন এই বাড়িতে আসি, তখন এই বাড়িতে বড়মা আর মাসিদিম্মা থাকতেন। মাসিদিম্মা আমার মায়ের মাসি, আর মায়ের দিদাকে বড়মা বলেই ডাকতাম। তেরো বছর বয়সে বাবা-মা'কে হারিয়ে যখন এই বাড়িতে আসি, তখন আমার সাথে আমার ভাই বিল্টু এসেছিল এই বাড়িতে। কিন্তু এখন আর নেই। ওই যে বললাম না জোর করে থাকতে পারবে না।

আমার এখনও মনে আছে বিল্টু আর আমি যেদিন প্রথম এ'বাড়িতে এসেছিলাম, মাসিদিম্মা আঁতকে উঠে বড়মা'কে বলেছিলেন, "আবার সেই ভুল করলে, নিয়মের বিরুদ্ধে গেলে সে শাস্তি দেবেই। বিল্টুকে এই বাড়িতে রেখো না।"

কিন্তু সদ্য মা'কে হারিয়ে বিল্টু আমাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছিল। আর সেটাই...

সেদিন মাসিদিম্মার কথায় ভেবেছিলাম, এই বাড়িতে কড়া দিদিমণি আছে, যে কিনা খুব শাস্তি দেয়। কিন্তু কড়া দিদিমণি নয়, ছিল তার থেকে শতগুণ ভয়ঙ্কর কিছু। তাকে চোখে দেখা যায় না, শুধু উপলব্ধি করা যায়। প্রথম প্রথম বাড়িটাতে এসে অবাক হতাম - এত বড় বাড়িতে থাকত শুধু দুজন! আমি আর বিল্টু আসার পর এক দুঃসম্পর্কের মামা বিল্টুকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু নিয়ে

যেতে পারেননি। নিয়তি নিয়ে যেতে দেয়নি। আর নিয়তির উপরে আর কেই বা উঠতে পারে। যে নিয়তিকে চ্যালেঞ্জ করেছে, তার কী পরিণতি হয় - সেটা আমি দেখেছি, কিন্তু তখন বুঝিনি। বুঝলাম কিছুদিন পরে।

এই বাড়িতে আসার দু'দিন আগে এক রাতে ঘরের মধ্যে ঘাড় ভেঙে মৃত অবস্থায় পড়ে ছিল মা-বাবা। তাদের দুজনের সারা মুখ অজস্র বলিরেখা ভরা ছিল। চোখগুলো সিদ্ধ ডিমের মধ্যে বেরিয়ে এসেছিল কোটর থেকে। বুঝেছিলাম, খুব ভয় পেয়েছিল দুজনেই।

মারা যাওয়ার আগের রাতে ঘুমের মধ্যে মায়ের কান্নার শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম।

কান্নার ভিতরে কাটা কাটা কয়েকটা শব্দ কানে এসেছিল "না... আভা নয়, আমার মেয়ে হবে না উত্তরসূরী।" তখন যদিও উত্তরসূরীর প্রকৃত অর্থ বুঝিনি। পরে বুঝেছিলাম - মা ছিল এই বাড়ির নির্বাচিত উত্তরসূরী। কিন্তু মা পালিয়ে যায় বাড়ি থেকে। তারপর বাবার সঙ্গে সংসার, মা ভুলেই গিয়েছিল অভিশপ্ত বাড়িটাকে। কিন্তু উত্তরসূরী ভোলে না তার শিকারকে। মা'কে না পেয়ে সে পরের শিকার বানাল আমাকে।

***

আর কিছু লেখা নেই, ওখানেই শেষ। ব্যস্ত হাতে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টেপাল্টে দেখছে বিনি। 'নাহ্, কিছু লেখা নেই আর!' হতাশ হয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে। ওর চোখের সামনে এখন প্রশস্ত আকাশ। দূরে দূরে জোনাকির মতো স্বল্প আলোয় আধো ঘুমে জেগে আছে শহরটা। পাঁচতলার এই আবাসনের সবচেয়ে উপরের তলার একটা ঘরে বিনির হাতে চামড়ার কভারে মোড়া একটা পুরানো খাতা, অনেকটা ডায়রির মতো, কিন্তু ডায়রি নয়। কিন্তু কী মিল দুজনের জীবনে!

বিনি, বিনীতা মুখার্জি শহরের একটি বেসরকারি স্কুলের শিক্ষিকা। আর পাঁচটা সাধারণ পরিবারের মতো বিনির পরিবার নয়। এই ফ্ল্যাটে বিনি আর তার দুই দিদা থাকেন। একজন বিনির মায়ের মাসি আর একজন মায়ের দিদা। মায়ের দিদাকে বড়মা আর মায়ের মাসিকে মাসিদিম্মা বলেই সে ডাকে ছোট থেকে। বিনির জীবনেও একই বিপর্যয় নেমে এসেছিল যখন সে ক্লাস ফাইভে পড়ে। ক্যান্সারে বিনির মা চলে গেলেন আর মায়ের মৃত্যুর শোক সামলাতে না পেরে বাবা কয়েকমাসের মধ্যে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে চলে গেলেন না ফেরার দেশে। তবে থেকে বিনি দুই দিদার সঙ্গে এই আবাসনের বাসিন্দা। কিন্তু পিছনের আরেকটা গল্প আছে। যদিও অনেক পরে বিনি সেকথা জানতে পারে, ততদিনে

অধিকাংশ ভূতের গল্পই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নয়। লক্ষ করে দেখবেন, প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই ঘটনার সাক্ষী কথকের ঠাকুর্দা, ঠাকুমা বা অন্য কোনও আত্মীয়, কিংবা কোনও বন্ধু। অর্থাৎ নিজের চোখে কেউ ভূত দেখেনি বললেই চলে।

আমি দেখেছি। অবশ্য এখন মনে হয় - না দেখলেই ভালো হত। আরো ভালো হত, যদি আরিফুল, আমি ছাড়া আর যে দেখেছিল - ব্যাপারটা আমাকে না জানাত। তবে সবথেকে ভালো হত, বলাই বাহুল্য, যদি আরিফুলের বাবা খাদেম শেখ তীব্র প্ররোচনার মুখেও উত্তেজনা দমন করে শান্ত থাকতে পারতেন।

নাঃ, এভাবে বললে আপনারা আমার কাহিনীর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারবেন না। বরং অন্য একটা ঘটনা থেকে শুরু করা যাক, যখন স্কুলের শেষে আমাকে একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে কথা বলতে চাইল আরিফুল।

স্কুল বলতে বড় আন্দুলিয়া হাইস্কুল। আসলে আমার পৈতৃক বাড়ি নদীয়ায়, কর্মসূত্রে কলকাতায় এসে থিতু হওয়ার আগে অবধি আমি ছিলাম সেই জেলার বড় আন্দুলিয়া গ্রামের বাসিন্দা। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে পদ্মা নদীর যে অংশটুকু আছে, তার থেকেই একটা শাখানদী দক্ষিণ দিকে বয়ে এসে নদীয়ার মায়াপুরের কাছে ভাগিরথীতে মিশেছে। মুর্শিদাবাদের জলঙ্গী গ্রামের কাছে উৎপত্তি বলে এই নদীর নাম জলঙ্গী। বড় আন্দুলিয়া জলঙ্গীর তীরে এক বর্ধিষ্ণু গ্রাম। সেখানে হাইস্কুল, হেলথ সেন্টার থেকে শুরু করে জমজমাট দোকান, বাজার সবই ছিল। সেই কারণেই আশেপাশের যাত্রাগাছি, শিকরা ইত্যাদি ছোটখাটো গ্রামের লোকের সেখানে যাতায়াত ছিল।

আমি যে সময়টার কথা বলছি, সেটা উনিশশো চুরানব্বই সাল, সম্ভবত মে বা জুন মাস। আমরা তখন বড় আন্দুলিয়া হাইস্কুলে এগারো ক্লাসে পড়ি, পরের বছর হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছি। আমার বাড়ি স্কুলের কাছেই, কিন্তু আরিফুল থাকত মাইলখানেক দূরের শিকরা গ্রামে। সাইকেলে চেপে যাতায়াত করত। পড়াশোনায় তার বিশেষ মাথা না থাকলেও খেলাধুলোয় সে ছিল চৌকস। কীভাবে সেটা এখন আর ঠিক মনে পড়ে না, কিন্তু আমাদের দু'জনের মধ্যে অন্তরঙ্গ সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। ব্যক্তিগত বিষয় নিয়েও নিজেদের ভেতর আলোচনা হত।

যাই হোক, সেই দিনটার কথায় আসি।

কয়েকদিন ধরেই আরিফুলকে কেমন যেন আনমনা দেখছিলাম। বরাবর মধ্যমেধার ছেলে হলেও ক্লাসে সে কোনদিনই অমনোযোগী ছিল না। কিন্তু ঘটনার একদিন আগে ইতিহাসের ক্লাসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকায় রহমান স্যারের কাছে ধমক খেয়েছিল। সেদিন অঙ্কের ক্লাসে তাকে প্রশ্ন করেও সাড়া না পাওয়ায় অঙ্কের শিক্ষক মিহিরবাবু যখন প্রচণ্ড রাগারাগি করলেন, তখন আমি নিচু গলায় প্রশ্ন করতে বাধ্য হলাম, "হ্যাঁ রে, তোর হলটা কী? বাড়িতে কোনও সমস্যা?"

আমার দিকে খানিকক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে শেষমেশ সে বলল,

"শরৎ, স্কুল ছুটির পর একটু দাঁড়াবি? তোর সাথে কথা আছে!"

শুনে একটু অবাক হলেও তখন আর কিছু বললাম না। ছুটির পর তার সঙ্গেই বের হলাম। গেটের বাইরে গুলমোহর গাছের নিচে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে, আরিফুল?"

সে সরাসরি আমার দিকে তাকাল। এই প্রথম দেখলাম, তার চোখদুটো ঈষৎ লাল - যেন রাতে ভালোভাবে ঘুম হয়নি।

সবিস্ময়ে আবার কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে সে বলে বসল, "আমার সাথে একবার আমার বাড়িতে যাবি, ভাই?"

এই প্রসঙ্গে একটা কথা জানিয়ে রাখা দরকার। এর আগেও আমি দু'একবার আরিফুলের বাড়িতে গেছি, সে-ও আমার বাড়িতে এসেছে কয়েকবার। আসলে সেই সময় আমাদের অঞ্চলে হিন্দু মুসলমান ভেদাভেদ বলে কিছু ছিল না। আমাদের পাড়ার দুর্গাপুজোয় আমাদের মুসলমান প্রতিবেশীরা অংশ নিত, পাত পেড়ে প্রসাদও খেত। আমরাও নিঃসঙ্কোচে তাদের বাড়ি ঈদের দাওয়াতে যেতাম। একবার ভরা বর্ষায় জলঙ্গীর ভাঙনে মসজিদ বাড়ি বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। গ্রামের হিন্দুরা মুসলিমদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাঁশ আর বালির বস্তার বাঁধ দিয়ে সেই ভাঙন আটকায়। বছর দুয়েক পরে একইভাবে গোপীনাথ জিউর মন্দির রক্ষা করতে মুসলমানরা ছুটে এসেছিল।

এরকম ঘটনা ঘটলে কখনোই তাকে ঢক্কানিনাদে অথবা ধ্বজা উড়িয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নজির বলে প্রচার করা হত না। সবকিছুই ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। আজকে এই মহানগরে এবং দেশের অন্যত্র দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্দেহ, বিদ্বেষ, এমনকি হিংসার বাতাবরণ যখন দেখি, খারাপ লাগে। বড় খারাপ লাগে।

তবে সেদিন আরিফুল যখন আমাকে তার বাড়ি যেতে বলল, তখন আমি একটু দ্বিধায় পড়লাম।

"কিন্তু আমি তো হেঁটে স্কুলে এসেছি। শিকরা যেতে হবে জানলে সাইকেলটা নিয়ে আসতুম!" আমতা আমতা করে জানালাম, "পায়ে হেঁটে অতদূর গিয়ে আবার এখানে ফিরতে তো সন্ধ্যা গড়িয়ে যাবে!"

এমনিতে আমরা যে স্কুল ছুটি হলেই বাড়িমুখো হতাম, এমনটা নয়। হাইস্কুলের পাশেই রীতিমত গোলপোস্ট বসানো ফুটবল খেলার মাঠ ছিল, সেখানে গিয়ে খেলতাম বা খেলা দেখতাম। বন্ধুদের সাথে আড্ডাও দিতাম মাঝেমধ্যে। তখনকার দিনে অভিভাবকরা ছেলেদের ওপর অতটা নজরদারি বা চাপসৃষ্টি করতেন না। মেয়েদের ক্ষেত্রে অবশ্য কিছুটা কড়াকড়ি ছিল, তবে সেটুকু নিরাপত্তার স্বার্থে। তবুও, সন্ধ্যা নামার আগেই আমাদের ঘরে ফেরা বাঞ্ছনীয় ছিল।

আমার কথা শুনে আরিফুল কিছুক্ষণ ভাবল।

"কিচ্ছু চিন্তা নেই, আমি তোকে আমার সাইকেলে ডাবল ক্যারি করব! নিয়ে যাব, আবার ফিরিয়েও দিয়ে যাব।" ভেবেচিন্তে সে বলল, "সন্ধ্যার আগেই ফিরে

গঙ্গার গতিপথের মধ্যে যেখানে সে নিজের জলরাশির দ্বারা হুগলী ও নদীয়ার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে সেইখানে তার বাম তীরে একটি গ্রাম মিহিনপুর। গ্রামে আগে কয়েকঘর তাঁতি বাস করত, কিন্তু তাদের কারুরই জীবিকা কাপড় বোনা ছিল না। শুধুমাত্র তাদের পদবী 'বুনইকর' আর ঘরের মধ্যে থাকা সুতো কাটার চরকাটা তাদের আদিপুরুষের জীবিকার সাক্ষ্য বহন করে চলেছিল। শোনা যায় এরা নাকি আগে অধুনা বাংলাদেশের নাগরিক ছিল, কিন্তু ইংরাজদের অত্যাচারে এদেশে এসে বাপ পিতামহের জীবিকা ছেড়ে চাষবাস শুরু করে। গঙ্গার মাঝে চড়াতে মাটি বড় উর্বর, সেখানে ফসলাদি ফলানো আর মা গঙ্গার মীন সন্তানের কৃপায় দিন খুব একটা খারাপ কাটছিল না তাদের। কিন্তু ক্রমাগত চর্চা রহিত থাকায় সুতোর কাজ তারা একেবারেই ভুলেছিল। কিন্তু বিধি বাম, অচিরেই গঙ্গার ভাঙনে সেই গ্রাম জলরাশির পেটের ভিতর সেঁধোলো। যে কয় ঘর লোক ছিল, তারা ঠিক করল আর এই পাড়ে নয়। অতএব কার্যত কপর্দক শূন্য অবস্থায় চরকা নিয়ে, নদীর পরপারে চন্দ্রগড়-এ এসে তারা আস্তানা নিল। অর্থাৎ একমাত্র ওই চরকা ছাড়া তাদের আর কোনও ভাবেই তন্তুর সঙ্গে সম্পর্ক রইল না।

এই গ্রামেরই শ্রী গঙ্গাধর বুনইকর-এর পুত্র বিশ্ব বুনইকর। মায়াবী চোখের ছেলেটি নবীন বর্ষায় স্নান করে ওঠা কদম গাছের মতো শ্যামল ও স্নিগ্ধ। অতএব গ্রামের যুবতীদের প্রধান আকর্ষণের জায়গাও যে সেই কদম গাছের তলাই হবে তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু বিশ্বর সেইদিকে কোনও খেয়াল নেই, নারী যে তাকে আকর্ষণ করে না এমন না, কিন্তু তার মন অন্য কিছু খোঁজে। ইস্কুল-এর গণ্ডি পেরোতে না পেরোতেই বাবা, তারক সাহার রেশন দোকানে কাজে ঢুকিয়ে দেন। যদিও তাতে যে সে খুব মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিল, তা নয়। এই কাজে সারা দিন খাটুনি, বিকালে বিরাম। তাই ইচ্ছে করলেই পটুয়া পাড়ায় গিয়ে প্রতিমা বানানো বা নদীর পাড়ে নৌকা বানানো দেখা যায়।

রেশন দোকানের আরেক কর্মচারী তপনের বাড়ি পাশের গ্রাম বোরোতে। গাজন উপলক্ষে সেখানে বিরাট মেলার আয়োজন হয়। বিশ্ব তপনের সঙ্গে তার গ্রামে আসে মেলা দেখতে। দুই বন্ধু মিলে মেলা দেখে এক চাঙারি জিলিপি আর খান দুই শিব ঠাকুরের ছবি নিয়ে বেশ রাত করেই তপনদের বাড়িতে ঢোকে। তপনদের একান্নবর্তী পরিবার, পরিবারে অনেকগুলি লোকজন, বাচ্চাকাচ্চা। কিন্তু এত রাতে কেউ আর জেগে নেই। ভাতের থালা আগলে শুধু তপনের মা আর বড় বৌদি বসে আছে রান্না ঘরে। সেই রাতে কোনরকমে কিছু খেয়ে ঘুমের অতলে তলিয়ে যায় বিশ্ব। ঘুম ভাঙে একটা খট খট শব্দে। শব্দটা বাইরে থেকে আসছে। ঘুম ভেঙে তক্তপোশের উপর উঠে বসে বিশ্ব। নতুন জায়গায় আশপাশ ঠাহর করতে একটু সময় লাগে। তারপর মাথার কাছে হ্যারিকেনটা একটু উস্কে দিয়ে নিচে নামে বিশ্ব। ভয় তার বরাবরই একটু কম, তাই সে একটু অবাক হল। এই আওয়াজ তার চেনা। এ তো তাঁত বোনার আওয়াজ। বাইরে থেকে

আসছে। এই অঞ্চলেও ঘরে ঘরে তাঁত বোনা হয়, তা সে জানে। কিন্তু এত রাতে তাঁত বোনে কে? একটু আশ্চর্য হয়ে ঘরের দরজা খুলে বাইরের দাওয়ায় এসে দাঁড়ায় বিশ্ব। উঠানের অপর পাশে একটা ঘরে টিম টিম করে লম্ফের আলো জ্বলছে। কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে যায় বিশ্ব। ঘরের ভিতর উঁকি মারে। একজন বৃদ্ধ খালি গায়ে চোখে একটা ভাঙা ফ্রেমের চশমা পরে ঝুঁকে বসে তাঁত বুনছেন। এতটাই একাগ্র হয়ে তিনি বুনছেন যে বিশ্বর উপস্থিতি তিনি টের পান না। অবাক হয়ে বিশ্ব তাকায় কাপড়টার দিকে। লম্বালম্বিভাবে টানা সুতোগুলির মধ্যে দিয়ে আড়াআড়ি ভাবে সুতো চলে যাচ্ছে মাকুর সাহায্যে আর তাতেই ফুটে উঠছে কী অপরূপ কারুকার্য। মুগ্ধ নয়নে বিশ্ব উপভোগ করতে থাকে - এ যেন তার কত কালের চেনা। কিন্তু বৃদ্ধ সহসা থমকে যান। কালো জমিনের উপর উজ্জ্বল নীল বর্ণের যে ময়ূর তিনি আঁকবার চেষ্টা করছেন, তা কিছুতেই হচ্ছে না। পাখির পায়ের কাছে এসে তিনি থমকে আছেন। বিশ্বর অবচেতনে কেউ যেন ঠেলা দিল। সে খানিক অযাচিতভাবেই বলে বসল, "আমি একটু দেখব?"

বৃদ্ধ এতটাই বুননে মগ্ন যে বিশ্বকে দেখে অবাক হওয়া তো দূরের কথা, তার পরিচয়টাই জানতে চাইলেন না। টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, জায়গা ছেড়ে দিলেন বিশ্বকে। যদিও বিশ্ব এর আগে কক্ষনো তাঁত বোনেনি, তাদের বাড়িতে ঠাকুরের আসনের ওপরে একটা পুরানো চরকা রাখা আছে সে দেখেছে। মাকে সকাল সন্ধ্যায় তাতে ধূপও দেখাতে দেখেছে, কিন্তু কক্ষনো বার করতে দেননি। বিশ্ব কৌতূহল দেখাতে গেলে সাবধান করে বলেছেন, "খবরদার, এই সুতোর কাজে আর নামতে হবে না। মাটি কুপিয়ে খাবি তাও আচ্ছা। কিন্তু এই কাজ কোনদিনও না। অলুক্ষণে কাজ এ, ভিটে, মাটি দেশ সব এই সুতোর জন্য ছাড়তে হয়েছে।"

মায়ের কথায় বিশ্ব অবাক হয়ে জানতে চেয়েছে, "তাহলে ওকে পুজো দাও কেনো? অত অলুক্ষণে যখন টান মেরে গঙ্গায় ফেলে দিলেই তো হয়।"

উত্তরে বিশ্বর মা বলেন, "অতশত জানি না, চিরকাল দেখেছি জ্ঞাতি গুষ্টি সব্বাই একে শনি ঠাকুরের মতো মানে, পুজো দেয় কিন্তু কাজে লাগায় না। তুইও খবরদার এই খুঞ্জি থেকে একদম বার করবি না।" বলে ভয়ার্ত চোখে আরেকবার প্রণাম করে সরে যান বিশ্বর মা।

যাই হোক, বিশ্ব কিন্তু খুব অনায়াসে ময়ূরের পা নিখুঁত করে বুনল। বৃদ্ধ খুব খুশি হলেন, আনন্দে তার চোখ চকচক করে উঠল। এতক্ষণে নবীন শিল্পীর দিকে তিনি ঘোলাটে দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে তুমি?"

বৃদ্ধের মুখ দেখলেই বোঝা যায় তিনি তপনের বাবা। দুজনের মুখের মধ্যে বেশ মিল। বিশ্ব বলল, "আজ্ঞে আমার নাম বিশ্ব বুনইকর। তপনের বন্ধু।"

সামনের লোকটি যেন এবার দুইয়ে দুইয়ে চার করতে পারলেন। তিনি হেসে বললেন,

"তা বাবা, আমি হলাম তপনের বাবা জনার্দন দাস।"

বিশ্ব হেঁট হয়ে প্রণাম করে। জনার্দন তার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেন,